একটা ব্যতিক্রমী ব্যবস্থার শেষ অধ্যায় কি দেখছি আমরা?

সহিষ্ণু সময়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্দলীয় হওয়ার কারণে এ সরকারের তিন মাসের শাসনকালে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির মধ্যে আসে একটা গুণগত পরিবর্তন। রাজনৈতিক সরকারের রেখে যাওয়া জটগুলো খুলতে থাকে একটির পর একটি। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের প্রাপ্য পাননি বিদায়ী সরকারের পক্ষপাতমূলক আদেশের কারণে, তাঁদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবিধান করে নির্দলীয় সরকার। অপরাধজগতের কর্মকাণ্ডেও ভাটা পড়ে। চিহ্নিত অপরাধীরা গাঢাকা দেয়। নির্বাচনের প্রস্তুতি সবার মনে আস্থার জন্ম দেয়, বিশেষত প্রশাসনের নির্দলীয়করণের ছবিটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হওয়ায় এই আস্থার পরিবেশ অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠে। ক'দিন আগেও যেখানে ঘুষ ছাড়া সরকারী দফতরে ফাইল নড়ত না, এ সময়ে মন্ত্রবলে সকল স্তরের কর্মকর্তারা রাতারাতি কর্তব্যসচেতন হয়ে ওঠেন। পুলিশের আচরণেও বিগত দিনের রুক্ষতা দূর হয়ে একটা সভ্য, মোলায়েম ভাব ফিরে আসে। সচিবালয়ে তদ্বিরওয়ালারা নেই, কারণ তদ্বির শুনবেন যাঁরা, সেই মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা নেই। ফলে লোভের- লাভের তুমুল তাণ্ডব থেমে গিয়ে সেখানে নেমে আসে এক স্বস্তির শীতলতা। অনেক ব্যক্তির মুখে শোনা যায় এমন উক্তি, আহা এ সরকার তিন মাসের না হয়ে যদি কমপক্ষে এক বছরের হতো। যারা এমন কথা বলে, তাদের ধারণা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু নির্বাচন নিয়ে কাজ করছে না, সুশাসন নামক হারিয়ে যাওয়া বস্তুটি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে।

এই বর্ণনাটা ইতোপূর্বেকার তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে আমরা যা দেখেছি তার সঙ্গে মেলে। এবারের ছবিটা একেবারেই আলাদা, আশা করি না বললেও চলে। এবার স্বস্তি আসেনি, অস্বস্তি বেড়েছে, অস্বস্তি রীতিমতো উদ্বেগের রূপ ধারণ করেছে। এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে না, টের পাওয়া যাচ্ছে সরকারপ্রধানের প্রবল উপস্থিতি। এবার সরকার বলতে দশজন উপদেষ্টার সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা প্রধান উপদেষ্টা নয়। প্রধানের মুখ একদিকে, দশজনের মুখ অন্যদিকে? এবার উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দূরত্ব বড় বেশি প্রকট। নিয়মিত বৈঠকের পুরনো ধারাটা এবার ভেঙ্গে পড়েছে। উপদেষ্টারা বৈঠকের অশায় তাকিয়ে থাকেন বঙ্গভবনের দিকে, ওদিক থেকে সাড়া মেলে না। বৈঠক না হওয়ার, নির্দিষ্ট কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অসন্তোষ চাপা থাকে না। বাধাটা আবার আসছে খোদ প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকেই। তিনি এ দলে একমাত্র ব্যক্তি যিনি নির্দলীয় নন। উপদেষ্টারা চান তাঁদের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে, প্রধান উপদেষ্টা চান পুরোপুরি তাঁর দলের স্বার্থে কাজ করতে। সেটা করতে গিয়ে কমবেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সেজন্য তিনি বেছে নিয়েছেন তাঁর কর্মকৌশল : তিনি যথাসম্ভব তাঁর উপদেষ্টাদের সংশ্রব এড়িয়ে চলবেন। দরকার হলে তাদের দু'তিনজনের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনায় বসবেন, দশজনের সঙ্গে বসবেন না। দশজন জোট বেঁধে একদিকে গেলে তিনি একা পড়ে যাবেন। যে চারজন তাঁর প্রতি বিরাগবশত পদত্যাগ করে চলে গেছেন, বড় উপকারই তাঁরা করে গেছেন। তাঁদের শূন্যস্থান তিনি পূরণ করেছেন এমন ব্যক্তিদের দিয়ে যাঁরা নির্বিরোধী হবেন বলে তাঁর আশা। তাঁদের কাছে কী ধরনের সদাচরণ তিনি চান, জানিয়ে দিতে ভুল করেননি। চারদলীয় জোটকে নির্বাচনে জয়ী করে আনবার জন্য যত কৌশল, সবই তাঁর একক দায়িত্বে তিনি প্রয়োগ করে চলেছেন, এ কাজে কাউকে পাশে রাখেননি। ফল হয়েছে এই যে, তাঁর উপদেষ্টারা বোধহয় ভাবছেন, এ কী চাকরি পেলাম আমরা, আমাদের সবার কাজ যদি একা প্রধান উপদেষ্টা তাঁর মর্জিমাফিক করবেন তো আমাদের কাজ কী?

উপদেষ্টাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাক না থাক, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। এই কমিশন পুনর্গঠনের কোন পরামর্শ, কোন দাবিতেই কর্ণপাত করেননি তিনি। তাঁর, ও তাঁর কমিশনের লক্ষ্য অভিন্ন, একটা যেনতেন প্রকারের নির্বাচন, যে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে জয়ী হয়ে আসবে চারদলীয় জোট। যে কমিশন আজ পর্যন্ত একটা নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করতে পারল না, তার প্রতি মোটেও ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ ঘটেনি তাঁর। সিইসিকে রাখা যায়নি স্বপদে। তিনি নিজ থেকে সরে গিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক কমিশনার যে বিদায়ী সিইসির শূন্য আসনে গাঁট হয়ে বসলেন, সেই আপত্তিকর কাজটাও তাঁর সম্মতি লাভ করল। যে দু'জন নতুন কমিশনার তিনি নিজ দায়িত্বে নিয়োগ করলেন, তাঁরা নিরপেক্ষ হবেন এই ঘোষণা দিয়ে, দেখা গেল তারাও এতটাই নিরপেক্ষ, তিনি নিজে যতটা নিরপেক্ষ। সারাদেশের সঙ্গে তাঁর এই মশকরা দেশ ভালভাবে গ্রহণ করেনি।

প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে নিরপেক্ষতার দাবি, তাঁর পদত্যাগের দাবি, একটি গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকার দাবি, অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির দাবি– কোন দাবিই পূরণ না হওয়ায় মহাজোট নির্বাচন বয়কট করেছে। বয়কট করতে বাধ্য হয়েছে। যে ঘটনা পরম্পরায় মহাজোট এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিল, তার পিছনে ছিল রাষ্ট্রপতি-প্রধান উপদেষ্টার হাত, আরও পিছনে ছিল বিএনপি নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের হাত। একটা একতরফা নির্বাচনই ছিল তাদের অভীষ্ট। সেই অভীষ্ট পূরণ হয়েছে। এখন তাঁরা দুনিয়া উচ্ছন্নে যাক তবু ২২ শে জানুয়ারি নির্বাচন হতেই হবে, এই দাবিতে অনড় রয়েছেন। আসন্ন নির্বাচনে ভরাডুবি হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে এখন তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছেন? সর্বদলীয় নির্বাচনের আশা এখনও ত্যাগ করেননি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশের কূটনীতিকরা। এক ধরনের একটা চাপও বহাল রেখেছেন তাঁরা রাষ্ট্রপতি-প্রধান উপদেষ্টার ওপর। সে চাপের মুখে নতি স্বীকার করবেন তিনি এমন লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি একটা মিশন নিয়ে প্রথমত রাষ্ট্রপতি, অতঃপর প্রধান উপদেষ্টার পদে সমাসীন রয়েছেন। মিশন চরিতার্থ হলে তিনি বঙ্গভবন থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন, এই তাঁর ইচ্ছা।

বঙ্গভবন অবরোধ, ২২ শে জানুয়ারির নির্বাচন প্রতিরোধ, এই দুই লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে মহাজোটের কর্মীরা। কড়া পুলিশী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে তারা। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীও তৈরি আছে প্রয়োজনে পুলিশ-বিডিআরের পিছনে দাঁড়াতে। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের মোকাবেলা করার জন্য। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটা মত ছিল, সেটা মনে হয় অগ্রাহ্য করা হলো। কেউ চায় না প্রতিরক্ষা বাহিনী বিতর্কিত হোক। কিন্তু শুরু থেকেই রাষ্ট্রপতি তাদের ওপর ভরসা রেখে চলেছেন। রাষ্ট্রপতি যেহেতু প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সুতরাং তাঁর নির্দেশ মানতে তারা বাধ্য। এই বিশেষ সুবিধাটা নিজের স্বার্থে কাজে না-লাগানোর সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারলেন না রাষ্ট্রপতি। পুনর্গঠিত উপদেষ্টামণ্ডলী কিভাবে নেবেন রাষ্ট্রপতির এই মিলিটারি-নির্ভরতা, একবার তাঁদের সম্মিলিত আপত্তির মুখে রাষ্ট্রপতিকে এ কাজ থেকে বিরত হতে হয়েছিল, সর্বশেষ পরিস্থিতিতে তাঁরা কী করেন, দেখার জন্য অপেক্ষা করছে দেশ।

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এই অনেক ঘর্মে-রক্তে অর্জিত ব্যবস্থাটিকে অকার্যকর করে দিল চারদলীয় জোট সরকার। কৃতিত্বটা তাদেরই– বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নয়, যেহেতু এটি ওই জোট সরকারের হাতে গড়া জিনিস। এটিকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে বিশেষ পরিকল্পনায়। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সেই পরিকল্পনার মধ্যবিন্দু। মাঝখানে ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে বিদায় নিতে হবে দশজন উপদেষ্টাকে। তাঁরা আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলেন তাঁদের ভূমিকা পালন করতে, কিন্তু এক জায়গায় তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁরা একজোট হয়ে প্রধান উপদেষ্টার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেননি। কেন পারলেন না, সেটা এক বড় প্রশ্ন হয়ে থাকবে আগামী দিনগুলোতে।

একতরফা নির্বাচনের পর কী হবে বা নির্বাচন আদৌ হবে কিনা এর উত্তর দেয়া এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। নির্বাচন যদি হয়, ৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় ফিরে আসবে, সরকার গঠন করবে, সংসদে বিরোধী দল কেমন হবে, কাদের নিয়ে হবে, এবং নতুন সরকার সারাদেশের, সারাবিশ্বের অবিশ্বাসের মুখে কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, এসবই এখন অনুমানের বিষয়। ছিয়ানব্বইয়ের ফেব্রুয়ারির একতরফা নির্বাচনজয়ী সরকার বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি, টিকে ছিল তিন মাসের মতো। এবার তারা ছয় মাস থাকতে চায় ক্ষমতায়। এ ধরনের একটা কথা চালু আছে বাজারে। ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের একজন যোগ্য উত্তরসূরিকে গদিতে বসানোর কাজটা সম্পন্ন করে তারপর আবার একটা নির্বাচন দেয়ার কথাই কি ভাবছে ৪ দলীয় জোট? বাহ্যত ক্ষমতাহীন একজন রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে কী অসাধ্য সাধন করতে পাবেন তার প্রমাণ রেখে গেলেন অতি নিরীহ, মৃদুভাষী অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। আমরা দেখলাম, এই দৃশ্যত গুরুত্বহীন পদটি আসলে গুরুত্বহীন নয়। এই পদটি নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের মূল্যায়ন সঠিক ছিল না। কারও মৃত্যুতে শোকবাণী পাঠানো ছাড়াও বাংলাদেশের শতসহস্র ঘরে শোকের হাওয়া বইয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, নগরীর রাস্তায় সশস্ত্র শান্তিরক্ষা বাহিনী নামিয়ে দিয়ে সেই বার্তাই পৌঁছে দিলেন তিনি।

মহাজোট গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের মোড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সবটাই ইতিবাচক হবে কিনা বলা সম্ভব নয়। মহাজোটে একটি চরমপন্থী ধর্মীয় দলের উপস্থিতির মূল্য কীভাবে দেয় আওয়ামী লীগ, তার ওপর অনেকটা নির্ভর করছে আমার প্রশ্নের উত্তর। জোটের শরিকরা আপাতত চুপ করে আছে, তবে বেশিদিন নাও থাকতে পারে। ক্ষমতার বাইরে যতদিন থাকবে জোট ততদিন প্রশ্নটা ছাইচাপা থাকবে। তবে ক্ষমতায় গেলে তা থাকবে না। তখন এ প্রশ্নের একটা সদুত্তর পেতেই হবে, এটা কি ক্ষণিকের প্রাপ্তি, না সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনোর পথ তৈরি করা?

[লেখক কবি শিক্ষাবিদ ও কলামিষ্ট]

বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে প্রবাসীরা উদ্বিগ্ন ওয়াশিংটনের চিঠি

হারুন চৌধুরী

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কথা শুনতে সবার কাছে অবিশ্বাস্য হলেও তিনি সবাইকে হাসালেন আশার আলোর পথ দেখালেন। ভার্জিনিয়ায় তিনি অতি স্বল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন। ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসী বাঙালীদের ডাকে সাড়া দিলেন। নোবেল বিজয়ের পর তাঁর ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতির শীর্ষস্থানীয় নেতারা এখন তাঁর সাক্ষাত পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। গত ১৯ নবেম্বর ভার্জিনিয়ার ওয়াটার ফোড অডিটরিয়ামে তাঁকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাত্র চল্লিশ মিনিট বক্তব্য রাখার পরই তিনি চলে যান অপর একটি অনুষ্ঠানে।

সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, তাঁর স্ত্রী হিলারীসহ অনেকে। গত ২০ নবেম্বর সিস্পন টিভি চ্যানেলে এই নোবেল বিজয়ীর ওপর সিক্সটি মিনিট নামের একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে একনজর দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বাঙালীরা। নির্ধারিত সময়ের আগেই হল পূর্ণ হয়ে যায়। উদ্যোক্তারা প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিলে বাইরে কয়েক শ' লোক অসহায়ের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভিড় ঠেলে পুলিশ স্কর্ট করে তাঁকে হলের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় তাঁর দুই ভাই ড. ইব্রাহীম ও জাহাঙ্গীর বললেন, একটা দর্শক বাইরে থাকা অবধি আমরা ভেতরে প্রবেশ করব না। হলের ভেতর প্রথম সারিতে বসা ছিলেন গ্রেটার ওয়াশিংটনের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। হলের ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখের পলক গিয়ে পড়ল একজন প্রধান ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তির ওপর। আর ব্যক্তিটি এখানে আবেগে নোবেল বিজয়ীকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উপস্থিত দর্শকদের দৃষ্টি তখন তাঁদের ওপর। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর ড. ইউনূস তাঁর পাশেই বসলেন। সংবর্ধনার ভাষণে প্রথমেই তিনি তাঁর এক সময়ের শিক্ষকের দিকে ইঙ্গিত করে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলবেন স্যারের বুদ্ধি ও পরামর্শ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায়। তাঁর নির্দেশেই আমি ফিরে গেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায়। তা না হলে হয়ত আমিও আপনাদের মতো প্রবাসেই থেকে যেতাম। ব্যক্তিটি বর্তমানে ওয়াশিংটন প্রবাসী জাতীয় অধ্যাপক বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. নূরুল ইসলাম। ড. ইউনূস আরও বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ। এখন থেকেই আমরা দারিদ্র্য দূর করব। এক সময় দেখা যাবে গোটা বাংলাদেশে কোন দরিদ্র লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা দারিদ্র্যকে মিউজিয়ামে ভরে রাখব। তাঁর কথায় অনেকে বিস্ময়বোধ করেন। আজ যা অবাস্তব আগামীকাল তা বাস্তবে রূপ দিতে পারে। টেলিভিশন আবিষ্কারের আগে যখন প্রচার করা হলো ভবিষ্যতে এমন যন্ত্র আবিষ্কার হবে মানুষ ঘরে বসেই বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে ছবিসহ কথা শুনতে পারবে। তখন ঐ বৈজ্ঞানিককে পাগল বলে অনেকে আখ্যায়িত করেছিল।

হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না : এখন নড়ে হাকিম তো হুকুম নড়ে না এ বাক্যটি ব্রিটিশ শাসনামল থেকে পাক আমলেও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এখনও এর যথাযথ ব্যবহার হয়। শুধু ব্যতিক্রম আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে।

দিনের আলোয় যে হুকুম জারি করা হয় রাতের আঁধারে তা কার্যকর করার আগেই বদলে যায়। সম্প্রতি চ্যানেল আইর সংবাদে জানা যায়, কেয়ারটেকার সরকার আট জন চুক্তিভিত্তিক সরকারী কর্মচারীর নিয়োগ বাতিল করার পর চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। এই তালিকায় জামায়াত নেতা বলে সর্বাধিক পরিচিত সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব ওমর ফারুকের নাম ছিল। এই ওমর ফারুকের কার্যকলাপ চারদলীয় সরকারের শাসন আমলে সবার জানা। তিনি পুলিশ বিভাগকে কলুষিত করে গেছেন, শিবির ও বিএনপির ক্যাডারদের পুলিশে নিযুক্তি দিয়ে। তিনি একজন শিবিরের জঙ্গী, হত্যা মামলার আসামী পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলে রাতেই তাকে টেলিফোন করে ছাড়িয়ে আনেন (সংবাদপত্রে প্রচারিত)। এই ওমর ফারুক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান বিটিআরসির চেয়ারম্যান হিসাবে। একুশের টিভিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যই তাঁকে এই সংস্থায় চেয়ারম্যান পদে রাখা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পরও তিনি কি করে এই পদে পুনরায় বহাল হলেন কার নির্দেশে–এটা প্রবাসীদের মধ্যে অনেকের জিজ্ঞাসা? বিগত স্বরাষ্ট্র সচিবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘটনার কথা সকলেরই জানা। স্বরাষ্ট্র সচিব কি করে উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া সামরিক বাহিনীকে একটা বিশেষ মহলের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহার করার জন্য সিভিল প্রশাসনে প্রেরণ করার প্রজ্ঞাপন জারি করেন। পর মুহূর্তে সে প্রজ্ঞাপন আবার প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এবার আসা

যাক চারদলীয় সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট পুলিশের কর্মকর্তা কোহিনুর মিঞার বদলির বিষয়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে পুলিশের সদর দফতরে ক্লোজ করার আদেশ দেয়। তার পরই সেই আদেশ একটি মহলের নির্দেশে বাতিল করা হয়। পুলিশের ট্রাকের চাপায় বর্বরোচিত হামলায় আওয়ামী লীগ নেতা ওয়াজিউল্লাহর মৃত্যুর পেছনেও কোহিনুর মিঞার নির্দেশ রয়েছে (প্রথম আলো, ১৫ নবেম্বর)। এর পরই তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে ওএসডি করে রাখা হয়েছে।

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে প্রবাসীদের দুশ্চিন্তা : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালীরা দেশের সঙ্কটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন, প্রধান উপদেষ্টার সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ও চারদলীয় জোটের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় দেশকে তিনি এক গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। বিদেশের পত্রপত্রিকায় পত্রিকায় বলা: যে দেশের মানুষ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায় সেই দেশেই অশান্তি। গত ৬ জানুয়ারি দেশের ব্যবসায়ী মহল এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই বিপর্যয়ের জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিনকে দায়ী করেছে। প্রবাসের সমস্ত সচেতন নাগরিক তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা একজন দলীয় লোক। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত প্রবাসী সচেতন মহল সময়োপযোগী মনে করেন। প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আজও দলীয় নিয়োগপ্রাপ্ত থানায় থানায় নির্বাচন তদারকি কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করা হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিগত জোট সরকারের মিডিয়া ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা আজও বহাল তবিয়তেই আছেন (জনকণ্ঠ)। চৌদ্দ দল কখন হরতাল- অবরোধের ডাক দিয়েছে? দেয়ালে যখন তাদের পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের কোন দাবিই যখন সরকার মানছে না, বিচারের প্রার্থনা করে সুবিচার পেতে বার বার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, দলীয় পুলিশ দিয়ে নেতাকর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে, বিনা কারণে কর্মীদের জেলখানায় আটক রাখা হচ্ছে, ক্রসফায়ারের নামে নিরপরাধ রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে, তখনই মানুষ প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে হরতালকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। এই হরতাল-অবরোধের ফলে ব্যবসায় হাজার কোটি টাকার লোকসান হলেও প্রতাজন্ত্রের রাজস্ব খাত থেকে যারা হাজার হাজার কোটি টাকা লুটতরাজ করে নিয়ে যায় সে তুলনায় কিছুই না। হরতালের ফলে যে ক্ষতি হয় তা কেউ রাজস্ব আয় থেকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে না; ক্ষণিকের দুর্ভোগ মাত্র। তা পুষিয়ে দেয়া যায়। মাটি দিয়ে পুকুর ভরাট করা যায় কিন্তু সাগর ভরা যায় না। এবার চারদলীয় জোটের ভরাডুবি হবে জেনেই প্রধান উপদেষ্টা চারদলীয় জোটকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাবার জন্য একমাত্র দলীয় পুলিশ বাহিনী ও সর্বশেষ ভরসা আমাদের সেনাবাহিনীকে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচন কেন্দ্র কৌশলে চারদলীয় জোটের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাবেন। এদের ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে গাড়ি ভাংচুর, সহিংস কার্যকলাপ চালিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রে শান্ত পরিবেশকে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে মহাজোটের কর্মীদের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনীকে মহাজোটের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোই তার প্রধান উদ্দেশ্য। তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেশের বিচার বিভাগ আজও চারদলীয় জোট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট প্রমাণিত। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মামলাকে তড়িঘড়ি করে পুনর্জীবিত করে তাঁর বিরুদ্ধে রায় প্রদান। তাঁর আপীল খারিজ করে দেয়া। মূল বিষয় এরশাদ সাহেব যাতে মহাজোটের হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারেন। আজ বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা নেই বললেই চলে। বিচার বিভাগকে তারা এমনভাবে দলীয়করণ করেছে বিচারের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে। বিচারপ্রার্থীকে বিচার চাইতে গিয়ে উল্টো আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হয়।

অনেকের মতে খালেদা-নিজামী বর্তমানে ৯০ দিনের জন্য ছুটিতে গেছেন। আসলে রাষ্ট্রপতিকে সম্মুখে রেখে দেশের প্রশাসন চলছে তাদের মাধ্যমে। তারা নির্বাচনে সবাইকে অংশ নিতে আহ্বান করছে। চারদলীয় জোট নিশ্চিত তাদের নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরই কোন এক মধ্যরাতে জোটের চারদলীয় লোকদের খালেদা-নিজামীর লিস্ট অনুযায়ী শপথ বাক্য পাঠ করাবেন আর একই সঙ্গে তিনি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দেবার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাবেন। জাতির কাছে বিভ্রান্তিকর ভাষণ দেবেন। দেশবাসী মধ্যরাতে রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুনে অবাক না হয়ে এবার হতবাক হবেন। মহাজোট যতই রাষ্ট্রপতিকে নিরপেক্ষ হবার জন্য অনুরোধ করুক না কেন প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি মনে করেন, তিনি কখন নিরপেক্ষ হবেন না।

[লেখক প্রবাসী সাংবাদিক]

নির্বাচনের পথে?

আরশাদ-উজ জামান

২২ জানুয়ারির আর দেরি নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন সাহেব বদ্ধপরিকর যে ঐ দিনই নির্বাচন হবে। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচন প্রস্তুতির কাজ করে চলেছেন ভারপ্রাপ্ত (?) প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাস্টিস মাহফুজুর রহমান।

বাংলাদেশের জনগণ এ রকম নির্বাচন দেখেনি। না, ১৯৯৬-এর নির্বাচনকে পুরোপুরি হার মানাতে যাচ্ছে ২০০৭ সনের নির্বাচন। এ নির্বাচনের প্রস্তুতি আরম্ভ হয় ২০০১ সনের নির্বাচনে বিএনপি আশ্চর্যজনকভাবে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সিট পেয়ে নির্বাচনে জেতার পর। হাওয়া ভবনে শুরু হয় পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি। এমনভাবে ছক কাটা শুরু হয় যেন ২০০৭ সনের নির্বাচন বিগত সমস্ত নির্বাচনকে কারচুপির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে। থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে যখন ২০০৩ সনে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সিটের স্টিমরোলারের মাধ্যমে একটি বিল পাস করা হয়, যার মাধ্যমে বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা দুই বছর বাড়িয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য, অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি কেএম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করা। কোন রাখঢাক ছাড়াই কাজটি সম্পন্ন করা হয়। কে এম হাসান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাগদাদে রাষ্ট্রদূতের চাকরি করেছেন। তিনি বিএনপির সদস্য। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান পদে যাঁকে বসাতে হবে তিনি হবেন নির্দলীয়, নিরপেক্ষ। প্রাক্তন চীফ জাস্টিসকে নির্দলীয় কিছুতেই বলা যাবে না। এর পরে আসে ইলেকশন কমিশনের প্রধান। সেখানে বসানো হয় এম এ আজিজকে। তিনি যে বিএনপির পক্ষপাতদুষ্ট সেটি সর্বজনবিদিত। আর পাঁচ বছরে মোটামুটি খোলাখুলিভাবে প্রশাসন সাজিয়েছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপি সরকার, যাতে সিভিল প্রশাসন, পুলিশসহ সম্পূর্ণভাবে তাদের পক্ষে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ রকম নগ্ন দলীয়করণের নজির নেই।

বিচারপতিদের বয়সসীমা বাড়ানোর সাথে সাথে বিরোধী দলগুলো যাদের মধ্যে অন্যতম শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন রূপ নেয় চৌদ্দ দলের জোটে, যার মধ্যে বামপন্থী দলগুলোই প্রথম সারিতে।

সদ্য ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া বিএনপি তার বিজয় সম্পূর্ণভাবে পাকাপোক্ত করার জন্য জাতীয় পার্টির প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে একটি নিকৃষ্টমানের খেলায় লিপ্ত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, জেনারেল এরশাদ সামরিক ক্যু করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এবং নয় বছর দেশের সর্বক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বিরোধী দলগুলো, সুশীল সমাজ একত্রিত হয়ে নব্বইয়ের ডিসেম্বরে একটি

গণঅভ্যুত্থান ঘটায় এবং জেনারেল এরশাদ ও তাঁর সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। বিএনপি শাসন আমলে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে তিনি কয়েক বছর জেল খেটেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এখনও অনেক মামলা ঝুলে আছে।

বেগম খালেদা জিয়া, যিনি গত দু'দশক ধরে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বে আছেন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক জিয়াকে রাজনৈতিক অঙ্গনে বহুদূর টেনে নিয়ে এসেছেন। তারেক জিয়া, দুর্নীতি এবং তার কর্মকাণ্ডের স্থান হাওয়া ভবন একটি অবিচ্ছেদ্য নাম হয়ে গেছে জনগণের মধ্যে। তারেক জিয়া বিএনপির রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ভীতি উদ্রেককারী নাম। সে এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গিয়ে হাজির হয় জেনারেল এরশাদের বারিধারার বাসভবনে। আবারও প্রায় খোলাখুলিভাবে একটি যৌথ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় যে, জেনারেল এরশাদ তাঁর দল জাতীয় পার্টিকে নিয়ে বিএনপির সঙ্গে যোগ দেবে এবং তার বদলে তাঁর মাথার উপরে ঝুলন্ত মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। যেমনি কথা তেমিন কাজ। এরশাদ তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাগুলো থেকে বিদ্যুৎগতিতে রেহাই পেয়ে গেলেন। তবে তিনি দরকষাকষি শুরু করলেন বাকি মামলাগুলো থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এবং বিএনপি জোটে যোগ দেবার ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করলেন। তিনি চৌদ্দ দলের জোট নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত রাখলেন। নির্বাচন যখন এগিয়ে আসছিল এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোট অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিল তখন জেনারেল এরশাদ হাত মিলালেন শেখ হাসিনার সঙ্গে।

কিছুদিন আগে ঢাকার বুকে এক মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন শেখ হাসিনা, জেনারেল এরশাদ এবং সদ্য গঠিত দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি) এবং তার প্রধান ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী জেনারেল জিয়ার সাথে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, শীর্ষ সারির নেতা ছিলেন। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরে বিএনপি তাঁকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করে। অল্প সময়ের মধ্যে কিছু হঠকারী নেতা যাদের মধ্যে বিএনপিপ্রধান খালেদা জিয়ার সন্তান তারেক জিয়া অন্যতম, তাদের নির্বোধ আচরণের কারণে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এবং দল গঠন করেন। হালে সেই দলে যোগ দিয়েছেন আরেক বিদ্রোহী নেতা চট্টগ্রামের ড. কর্নেল (অব) অলি আহমদ। দলের নতুন নাম এলডিপি। এই দলের মহাসচিব মেজর (অব) মান্নান, যিনি বিএনপি সরকারের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই মঞ্চ থেকে ঘোষণা এসেছিল, শত বাধা সত্ত্বেও নির্বাচনে অংশ নেবার। তবে বাংলার আকাশ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল সে ব্যাপারে কারও কোন সংশয়ের অবকাশ ছিল না।

এরপরের নাটকটি আবার জেনারেল এরশাদকে কেন্দ্র করে। বিএনপির প্ররোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে বহু পুরনো একটি মামলা তোলা হয় এবং অতি ত্বরিত গতিতে তিনি সাজাপ্রাপ্ত হন। মোট কথা হলো, এই সাজার মাধ্যমে এরশাদকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা এবং তাঁকে আবার জেলে ঢোকানো। এই ঘটনা দ্বারা বিএনপির যে বিকৃত রুচির বহির্প্রকাশ ঘটেছে সেটা লক্ষণীয়। তবে এই ঘটনার মাধ্যমে যেটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়েছে সেটি হলো, প্রশাসনযন্ত্র এবং উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত দলীয়করণ।

চৌদ্দদলীয় জোট, এলডিপি এবং জাতীয় পার্টি একটি সংবাদ সম্মেলন করে গত ৩ জানুয়ারি। এই তিন নেতা একত্রে ঘোষণা দেন যে, তাঁরা নির্বাচন বর্জন করছেন এবং তাঁদের সমস্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। নির্বাচন পুরোপুরিভাবে একদলীয় প্রহসনের নির্বাচনে পরিণত হয়েছে।

আমাদের নির্বাচন নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর মাথাব্যথার অন্ত নেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে হাই প্রোফাইল হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং কিছুটা জাপান, প্রধান দাতা দেশ হিসাবে। বাংলাদেশে অবস্থানরত এদের প্রতিনিধিগণ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পক্ষে। তাঁরা চান সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন।জাতিসংঘের মহাসচিবও সে কথাই বলেছেন। কারণ মহাজোটের অংশগ্রহণ ছাড়া যে ২২ জানুয়ারি নির্বাচন নিতান্তই হাস্যকর একটি বিবর্ণ প্রয়াসে দাঁড়াবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৪ দলীয় জোট, এলডিপি এবং জাতীয় পার্টির যৌক্তিক দাবি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ (তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করে এ পদটি আঁকড়ে ধরেন), নতুন নির্বাচন কমিশন (বর্তমান ভারপাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার বেআইনীভাবে নিজেই পদটি দখল করেছেন) আরও আনুষঙ্গিক পরিবর্তন। অবশ্যই সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনের তারিখ পেছাতে হবে।

১৯৯৬ এবং ২০০৭-এর মধ্যে পার্থক্য যে, এখন যে ঝড়টি ওঠার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে সেটি তৈরি হতে অনেক সময় লেগেছে। আর এরই মাঝে আবির্ভূত হয়েছে নতুন দল এলডিপি– তার প্লাটফর্ম হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ আর গণতন্ত্র। জনগণ আজ দুর্নীতি থেকে প্ররিত্রাণ পাবার জন্য প্রস্তুত। আশার বাণী কে শোনাবে? জনগণের আকাঙ্ক্ষা কে পূরণ করবে ?

[লেখক প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং ওআইসির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব]

জীবনকথন

রণজিৎ বিশ্বাস

জীবনে যাহা কোনদিন করি নাই, হয়তো কোন দিন আর করিবও না, একদিন তাহাই করিতে বসিয়াছিলাম। টেলিফোন নামের যন্ত্রটি সহায়তা করে নাই বলিয়া করিতে পারি নাই। পুরাটা শুনিবার পর এক সুহৃদ-সহকর্মী বলিলেন–করেন নাই, ভালো করিয়াছেন; ফোন আপনাকে সহায়তা করে নাই, তাহা আরও ভালো হইয়াছে, বেজান যন্ত্রটিকে প্রাণ খুলিয়া ও মন ঢালিয়া ধন্যবাদ দিতে পারেন। আপনার প্ল্যান-পরিকল্পনামত বিটলামিবুদ্ধিতে যাহা করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা হইয়া গেলে বিপদে পড়িতেন। ভয়াবহ বিপদে পড়িয়া যাইতেন। মার খাইতে খাইতে এমনিতেই পিঠের চামড়া খসাইয়া বসিয়াছেন, যদি ধরা পড়িতেন, উহারা আপনার অস্থি হইতে মাংসটাও ছাড়াইয়া লইত। এবং, আমি নিশ্চিত, আপনার বুদ্ধিসুদ্ধির আঁশ যেমন মোটামোটা, ধরা আপনি পড়িতেনই।

বিষয়টি এইবার পরিষ্কার হউক। টেলিভিশনের একটি প্রাইভেট চ্যানেলে সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি অনুষ্ঠান চলিতেছিল। জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিবসে। দেখিবার জন্য বসিয়া পড়িলাম।

বসিয়া পড়িলাম তাহাকে দেখিয়া, যিনি স্টুডিওতে আমন্ত্রিত কয়েকজন সাংবাদিকের প্রশ্ন ও দর্শকদের টেলিফোন-প্রশ্নের জবাব দিতে বসিয়াছেন। একটি সফেদ পাঞ্জাবি পরিয়া। ছাত্রজীবনে না চিনিয়া না জানিয়া ও নাম শুনিয়াই শুধু যাহাদের নেতা মানিয়া লইয়াছিলাম ঢাকা শহর হইতে প্রায় আড়াই শ' মাইল দূরে বসিয়া, ষাটোর্ধ এই মানুষটি তাহাদের একজন।

এইরকম কাজ আমি মাঝেমাঝে করিয়া বসি। অশুদ্ধ চরিত্রের কিছু মানুষ যখন অন্যের চরিত্র বিশুদ্ধ করিবার এবং তাহাদের ইহলোক ও পরলোক আলোকে আলোকময় করিয়া দিবার অনুষ্ঠান করে, তখনও আমি টেলিভিশন সেটের সামনে বসিয়া যাই। ঘরের লোকজন উহা দেখিয়া হাসে, টীকাটিপ্পনি কাটে। আমি উপভোগ করি।

এই অনুষ্ঠানটিও সেই রকম। প্রশ্ন করিবার জন্য যাহাকে উপস্থিত করানো হইয়াছে, সত্যপ্রীতি, সততা, সুশিক্ষা ও সুরুচির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। লোকটি প্রতিপত্তির সঙ্গে আছে এবং পর্যাপ্ত অর্থবিত্তের সঙ্গে আছে। এইখানে সেইখানে, মাঠেময়দানে, আলোচনার টেবিলে, টেলিভিশনের পর্যায়, যেইখানেই আমি তাহাকে দেখি, অবাক চোখে তাকাইয়া থাকি এবং কৌতুক বোধ করি। জীবনে যখন

তারুণ্য ছিল, অন্তরে যখন স্বপ্নের সুবাস ছিল, মাথায় যখন কবিতা ও কবিতার মত সুন্দর মানুষ ছিল, তখন খাইয়া না খাইয়া উহাদের নামে স্লোগান দিয়াছিলাম, পোস্টার লিখিয়াছিলাম এবং আরও অনেক কিছু করিয়াছিলাম। এখন ভাবিতে গেলেই লজ্জা পাই, নিজের মনের ভিতর ঘৃণার ভাণ্ড ভরিয়া উঠে। নিজেকে নিজে কোটি কোটিবার ইডিয়ট ডাকিতে ইচ্ছা করে। ইহাও বুঝিতে পারি, তারপরও বিক্ষুব্ধ মন শান্ত হইবে না।

পর্দার নিচের দিকে কয়েকটা টেলিফোন নম্বর ভাসিয়া উঠিতেছিল ও ডান হইতে বামদিকে চলিয়া যাইতেছিল। প্রথম নম্বরটা টুকিয়া রাখিলাম। উদ্দেশ্য, ঐ লোকটিকে 'খুব ছোট' ও খুব বড় দুইটি প্রশ্ন করিব। তাহার ব্যক্তিগত দুর্নীতির বিষয়ে বাজারে যে গর্মাগরম বাতাস বহিতেছে, সেই সম্পর্কে তিনি নিজে কী বলেন, জানিতে চাহিব এবং মুক্তিযুদ্ধ নামের বিষয়টি যে এই দেশে কোনকালে ঘটিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়ে কিনা ও তখনকার ভূমিকার সঙ্গে তাহার এখনকার ভূমিকা পাশাপাশি রাখিলে নিজেকে তাহার যুদ্ধাপরাধীর চাইতেও অধম মনে হয় কিনা, তাহাও পুছিয়া বসিব। জবাব লোকটি দিক বা নাদিক, প্রশ্ন শুনিবার পর তাহার মুখের রেখাপরিবর্তনটা আমি লক্ষ্য করিব এবং মনে মনে একশত সাঁইতিরিশ বার তাহাকে বিশেষ বিশেষ শব্দাবলীতে 'আশীর্বাদ' করিব।

পরপর দশবার চেষ্টা করিলাম। একটি বারের জন্যও পশিতে পারিলাম না। কেন যে নম্বরগুলি দিস বাছারা (!)– বিরক্তিতে গজগজ করিতে করিতে ফোন রাখিয়া দিলাম। এতক্ষণ চেষ্টা করা গিয়াছিল ঐ সময়টায় ফ্রি থাকিবার কারণে। বাসার দুই প্রজন্মের অতি কড়া দুই প্রশাসকই তখন পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল।

রক্ষা, গিয়াছিল; নহিলে নির্ঘাত তাহারা আমার হাতের মুঠি হইতে ফোনটি ছিনাইয়া লইত। আমাকে 'উপরি' হিসাবে শুনিতে হইত–দয়া করিয়া আমাদের বাঁচাও তুমি, জীবনে অনেক কিছুই তুমি আমাদের দিয়াছ, পাগলামি করিয়া বিপদের পাক আর ঘন করিও না। আশ বুঝিতে পার, পাশ বুঝিতে পার, পরিবেশ বুঝিতে পার, হাওয়া বুঝিতে পার, বাতাস বুঝিতে পার, এনভায়রনমেন্ট বুঝিতে পার, তারপরও ইডিয়টিক ন্যাচারের এমন সব বুদ্ধি তোমার মাথার খোপে আসে কোথা হইতে!

শুনিয়া সহকর্মী বলিলেন– কথাতো ঠিকই। আপনি যদি উহাদের কানেক্ট করিতে পারিতেন, কী হইত বুঝিতে পারিতেছেন?

: কী হইত? : ঐ লোকটি, আচরণে নীতিরহিত যাহাকে আপনি যুদ্ধাপরাধী হইতেও অধম ডাকিবার জন্য মনে সমস্ত জোর একাট্টা করিয়া বসিয়াছিলেন, অনুষ্ঠান ছাড়িয়া উঠিয়া যাইবার সময় আপনার ফোন নম্বরটি তিনি চাহিয়া লইতেন। এমনিতে পাওয়া না গেলে ধমকাইয়া লইতেন। তাহার যাহা পজিশান, উহারাও ভয়ের চোটে পিড়পিড়াইয়া দিয়া ফেলিত। তারপর দেখিতেন ঐ নম্বর ধরিয়া হদিস বাহির করিয়া তিনি কী করিতেন। বুঝিতে পারিতেন, মোরব্বা বানানো কাহাকে বলে। এমনিতেই আপনি আছেন নয় হাজার নয় শত নিরানব্বইটা 'আনন্দ' লইয়া, তারপর দেখিতেন আরও কী কী হইত। দ্য হেভেন সেইভড য়্যু!

আমি আমার অভিজ্ঞতামত ও বদস্বভাবমত যোগ করিলাম–ইয়েস, দ্য হেভেন সেইভ্ড মী, ইফ দেয়ার বী অ্যানি। তিনি হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন– আপনি আর বদলাইলেন না। আমি বলিলাম–বদলাইব কী করিয়া! পাহাড় সরিতে পারে, কিন্তু মানুষ বদলাইতে পারে না। স্বভাব তাহার ঘুমায় কখনও কখনও, কিন্তু মরিয়া যায় না। আমাকে দেখিয়াও বুঝিতে পারেন; আমাকে যাহারা মারিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের দেখিয়াও বুঝিতে পারেন।

[লেখক কথাসাহিত্যিক]

মাস্টারদা সূর্যসেন

প্রেম রঞ্জন দেব

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও আত্মত্যাগের প্রতীক মাস্টারদা সূর্যসেন। ১৮৯৪ সালের ২১ মার্চ সূর্যসেনের জন্ম এবং ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারিতে ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যু। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলনের অন্ধকার মঞ্চের পাদপ্রদীপের নিচে মাস্টারদার আবির্ভাব ছিল নাটকীয় এবং সময় ছিল প্রতিকূল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি নরমপন্থী, কখনও বা আপোসপন্থী, অন্যটি বিপ্লবী ও চরমপন্থী। তবে এই উভয় ধারাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে সংযুক্ত ছিল। বিপ্লবীরা যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি গোপন দলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও একই সঙ্গে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসেরও নেতাকর্মী ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবেআত্মপ্রকাশ করে। নরম বা আপোসপন্থী নেতৃত্ব বিশ্বাস করত ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আইনসভায় নিজেদের আসনসংখ্যা বাড়িয়ে আবেদন-নিবেদনের দ্বারা কিছু সংস্কারমূলক দাবি আদায় এবং সীমিত পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন। অন্যদিকে বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করা। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিপ্লবের এই অগ্নিগর্ভ অধ্যায়ের সিংহভাগে ছিলেন বাংলার বিপ্লবীরা। ক্ষুদিরাম থেকে প্রীতিলতা, সূর্যসেন পর্যন্ত শত শত মহান বিপ্লবীর আত্মদান শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করেই তোলেনি, একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অপরাপর উপনিবেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামকেও অনুপ্রাণিত করেছে।

মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন তাঁর গোপন বিপ্লবী তৎপরতাকে আড়াল করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনও কংগ্রেসের অহিংস নরমপন্থী রাজনীতির প্রতি আসক্ত ছিলেন না। ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরি চৌরা হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে দেশবাসীকে শুধু চরকায় সুতাকাটা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানালে কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতারাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। জাতীয় রাজনীতিতে দেখা দেয় গভীর হতাশা। বাংলার বিপ্লবীরা আবার জেগে ওঠেন। বিভিন্ন জায়গায় ব্রিটিশ সৈন্য, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের ওপর হামলা শুরু করেন বিপ্লবীরা। এসব কর্মকাণ্ডের দরুন বহুবার নাটকীয়ভাবে পুলিশের গ্রেফতারী থেকে রেহাই পেলেও ১৯২৬ সালের শেষের দিকে মাস্টারদা ধরা পড়েন। বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ যাতে তিনি রাখতে না পারেন সেজন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় বোম্বের রত্নগিরি জেলে। ১৯২৮ সালে অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯২৮ সালের ২২ ডিসেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধী-নেহরু প্রস্তাবিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব পাস হওয়ায় বাংলার বিপ্লবীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এনেছিলেন। সূর্যসেন ও তাঁর অনুসারীরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করাতে পারেননি। আর এই অধিবেশনের পর পরই নেতাজীর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রূপান্তরিত হয় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন– "কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইবার পরে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীই সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' রূপে সারা বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার প্রধান নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল। ইহাদের ও অন্যান্য কয়েকজনের সহায়তায় চট্টগ্রামের প্রবীণ বিপ্লবী নেতা সূর্যসেন (মাস্টারদা নামে সমধিক পরিচিত) পূর্ণ উদ্যমে সামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করিতে

আরম্ভ করিলেন। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক-নেতার নির্দেশে ও গঠননৈপুণ্যে সারা চট্টগ্রাম জেলায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। সূর্যসেনের আশা ছিল চট্টগ্রামে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে ক্রমে তাহা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িবে। সমর বাহিনীর নাম দেয়া হইল 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। অস্ত্রশস্ত্র, বোমা প্রভৃতি সংগৃহীত হইল, রীতিমতো প্যারেড ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা চলিতে লাগিল।" আর এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজদের সশস্ত্রভাবে মোকাবেলা করার জন্য সংগোপনে বিপ্লবীদের চরম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল রাত দশটায় চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হবে। আইরিশ বিপ্লবীদের ইস্টার বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত বলেই ঐ তারিখটি নির্ধারিত হয়েছিল। সমর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন মাস্টারদা সূর্যসেন। যুদ্ধের অধিনায়ক কমিটির সদস্য হলেন– নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী ও উপেন ভট্টাচার্য। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা 'পুলিশ আর্মারি' আক্রমণ করবে। নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা 'রেলওয়ে আর্মারি' আক্রমণ করবে। নরেশ রায় ও ত্রিগুণা (ত্রিপুরা) সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধস্বরূপ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সাহেবদের হত্যা করবে। অন্যদিকে ৩০ জনের এক বিপ্লবী পদাতিক বাহিনী পুলিশ আর্মারির কাছে গুপ্ত স্থানে অপেক্ষা করবে এবং প্রয়োজনমতো উপরোক্ত দলগুলোর সাহায্যে অগ্রসর হবে। নিকটেই মাস্টারদা সূর্যসেন রক্ষীসহ একটি মোটরে অপেক্ষা করবেন। প্রথমোক্ত তিনটি দল কার্য সম্পন্ন করে সর্বাধিনায়কের সঙ্গে মিলিত হবে। এই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে এবং মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছিল।

বিপ্লবীরা ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করে ইংরেজ সৈন্যদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে পরাজিত করে চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভের পর সূর্যসেন 'সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার' গঠনের ঘোষণা দেন। ঐ সালের ২২ এপ্রিল চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্যসেনের বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে যার নজির ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দ্বিতীয়টি ছিল না। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে জয়ী হবার পর সূর্যসেন গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাস্টারদা নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন– 'শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী, সুতরাং সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। সতত নিরবচ্ছিন্ন এবং যথাসম্ভব শক্তিশালী আঘাতে আঘাতে এই শত্রুকে দুর্বল করতে হবে। যেহেতু নানাভাবে চট্টগ্রামে প্রভূত পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ আসবেই সেহেতু প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলা পন্থায় সংগ্রাম পরিচালনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।' আর এভাবেই আরম্ভ হলো, মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়–নতুন পদ্ধতিতে গেরিলা পন্থায়। এতে অনেক সাফল্য আসে। বহু চেষ্টার পর ১৯৩৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সরকার সূর্যসেনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই পরিচালনার জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে সূর্যসেনকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং মৃতদেহ দুইটি লোহার সিন্দুকে ভরে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা হয়। আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের অনন্য নক্ষত্র সূর্যসেন ইতিহাসের পাতায় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবেই চিরভাস্বর হয়ে থাকেন।

[লেখক গবেষক ও রাজনীতিবিদ]